নদী বহমান পানি অফুরান

দিলরুবা শাহানা

বাংলাদেশে নদ-নদী, খালবিল গাছের পাতার শিরা উপশিরার মতই দেশটির অবয়ব জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। সেই জল কল্লোলিত দেশের সম্ভাবনার কথা শুনলে কার না মনে আনন্দ হয়।

সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে পাঠককে মনে করিয়ে দিচ্ছি এর আগে লিখিত পরিবেশ সম্পর্কিত এক প্রবন্ধে(মানুষ ও মাকড়সা) বাংলাদেশে পানির অপচয়ে মানুষের উদাসীনতা সম্পর্কে লিখিত হয়েছিল। বরাবর মনে হয় প্রজ্ঞার সাথে পানি ব্যবহৃত হলে আমাদের বাংলাদেশ অনেক উপকৃত হবে। আপাতদৃষ্টে নদীবহমান দেশের পানি অফুরান মনে হলেও সে পানি সমস্যামুক্ত নয়।

প্রবাসী অনেকেই বাংলাদেশে গেলে পানি পানে আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তাদের ঠিক দোষও দেয়া যায়না। যখন কেউ নাক সিটকে অভিযোগ করেন যে ঐ পানি খেয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে হাসপাতাল পর্যন্ত বাহিত হয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ তেমন দূর্ভোগে না পড়লেও কিছুটা সময়ের জন্য তাদের সঙ্গী ছিল বদ্‌না আর গন্তব্য হয়ে পড়েছিল পায়খানা। ইত্যাদি কারনে তারা বাংলাদেশের পানির উপর মহা খাপ্পা। তারা

একবারও ভেবে দেখেন না যে, পানি যদি এতোই খারাপ তাহলে বাংলাদেশের অনেক মানুষই অতি সহজে ভবলীলা শেষ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তেন। বাস্তবে তেমন ঘটছেনা। কেন? কেন?

আসলে প্রবাসীদের নিজেদের ইম্যিউন সিস্টেম(রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা) বিদেশের ভেজালহীন খাবার খেয়ে ও বিশুদ্ধ পানি পান করে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ব্যাপারে নাজুক হয়ে পড়েছে। প্রবাসীদের তুলনায় ভেজাল খাবার খেয়েও ও নিম্ন মানের পানি ব্যবহার করেও বিস্ময়করভাবে বাংলাদেশের মানুষের ক্ষতি কম হচ্ছে। এতে বোঝা যাচ্ছে In terms of survival capacity বাংলাদেশের মানুষ অনেক শক্তপোক্ত । কথাটা ঠিক নয় কি? তবে কি তারা ঐ অবস্থাতেই পড়ে থাকবেন? অবশ্যই নয়। সচেতন ও বিবেকবান মাত্রই স্বীকার করবেন যে অবশ্যই পৃথিবীর সব মানুষের মত তাদেরও অধিকার আছে নির্ভেজাল খাবার ও বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তির।

বছর কয়েক আগে(অর্থাৎ ৩০শে জানুয়ারী ২০০৭সালে) অষ্ট্রেলিয়ার এক টিভি চ্যানেলে পানি সংকট নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। নিত্যব্যবহার্য পানির দাম বাড়িয়ে মানুষকে পানি কম খরচ করতে বাধ্য করার কথা ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে। পিটার সিঙ্গার নামে এক আলোচক (যিনি সেলিব্রেটি দার্শনিক হিসাবে পরিচিত) জানালেন যে তার পরিবারে সবাই বালতিতে পানি ভর্তি করে নিয়ে তা থেকে খরচ করছেন। আলোচনায় আসলো যে পানি সংকটের কারনে ভবিষ্যতে অষ্ট্রেলিয়াতে ধান ও নারকেলের চাষ সংকুচিত করতে হবে। উপস্থাপক আতংক নিয়ে জানতে চাইলেন তাহলে উপায় কি? পিটার সিঙ্গার বললেন নদীর দেশ বাংলাদেশে পানির সমস্যা নাই। ওখানে চাল ও নারকেল প্রচুর উৎপাদিত হয়। ওখান থেকে আনা যেতে পারে।

সবসময় মৌমাছির গুঞ্জনের মত শুনতে হয় দরিদ্র ও প্রায় সম্ভাবনাহীন একদেশ বাংলাদেশ। তার মাঝে এ ধরনের ইতিবাচক কথা মনকে প্রফুল্লতায় পূর্ণ করে দেয়।

তবুও বাংলাদেশে সবসময় সবাই যে প্রয়োজন মতো যথেষ্ঠ পানি খরচের জন্য পাচ্ছেন তা নয়। দরিদ্র বস্তিবাসীর কথা তুলছিনা। শিল্পশ্রমিকরা কর্মসম্পাদনের সময়ও আইনতঃ প্রাপ্য পানিটুকু পান না, প্রক্ষালনের মানসম্মত ব্যবস্থা নেই। একসময়ে শ্রম আইন নিয়ে কিছু কাজ করছিলাম। আমাদের সমমনা ক'জনের স্বপ্ন ও বিশ্বাস ছিল যে Demystification of Law(আইনের রহস্যভেদ) মানুষের প্রাপ্য আদায়ে খুব জোর ভূমিকা রাখবে(আসলে কি!)। এই বিশ্বাস নিয়ে তখন আইনের তথ্যসম্বলিত বেশ কিছু পুস্তিকাও সহজসরল ভাষায় আমরা(শাহীন আখতার, আমি) লিখি। সিগমা হুদার সংগঠন মানবাধিকার বাস্তবায়ন সে পুস্তিকাগুলো প্রকাশ ও প্রচারে ভূমিকা রাখে। সেই সময়ে আই, এল, ও কনভেনশনের সাথে বাংলাদেশের শ্রমআইনের সামঞ্জস্য কতটা মিলিয়ে দেখতে বেশ দলিলদস্তাবেজ ঘাটাঘাটি করি তাতে

দেখা গিয়েছিল বাংলাদেশের বিধিবদ্ধ(Codified) শ্রম আইন আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও ভাল। তবে অনুসন্ধানে দেখা গেল এর প্রয়োগ দুঃখজনকভাবে একেবারেই নগন্য। শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় বন্দী আইন । পৃথিবীর অনেক দেশেই আইন ভাল থাকলেও প্রয়োগ কম হয়। যেমন যুদ্ধের আইন হচ্ছে বেসামরিক মানুষ হত্যা করা যাবে না। বাস্তবে এই আইনকে কেউই মানছে না। ন্যাটো নিরীহমানুষ নির্বিচারে মেরে চলেছে। তবে ন্যাটো প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে প্রতিদিন।

সেই সময়ের বাংলাদেশে শুধু পানির কথাই যদি ধরি তারও আইন নির্ধারিত সরবরাহ নিশ্চিত করেনি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান । শ্রমিকের সংখ্যানুপাতে যতগুলো টয়লেট ও প্রক্ষালনের সুবিধার্থে মাথাপ্রতি যত গ্যালন পানি সরবরাহ করার কথা তার কোন ব্যবস্থা কোথাও ছিলনা।

আজ পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে আমরা কথা বলছি। শিল্পকারখানায় পানির সঠিক সরবরাহ ব্যবস্থাও পরিবেশের সুস্থতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা সবার জানা। শিল্পউৎপাদনের ফলে রাসায়নিক মিশ্রিত দূষিত পানি খালবিল বা নদীতে(যেমন শীতলক্ষ্যা) ফেললে পরিবেশ নষ্ঠ হয় ও হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত মানবিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করলে তা উৎপাদনে সাহায্য করে। যেমন পানিসহ টয়লেট দরকার তেমনি চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সুস্থতার জন্যও পানির সুষ্ঠু ব্যবহার প্রয়োজন।

কারখানায় উৎপাদনে ব্যবহৃত পানি রিসাইক্লিং বা পরিশোধন করে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পানির সাশ্রয়ও হবে, পরিবেশও কম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বাস্তবে এমনটি দেখাও গেছে।

বাংলাদেশের একটি উন্নয়ন সংস্থায় এমনি পানি শোধন (রিসাইক্লিং) করে পূণর্বার ব্যবহার করা দেখে অনুসন্ধিৎসু হই। ঢাকা থেকে সামান্যদূর মানিকগঞ্জ। এখানেই রয়েছে ব্র্যাকের আয়েশা-আবেদ ফাউন্ডেশন- হস্তশিল্পের উৎপাদন কেন্দ্র। সূচীকর্ম, ব্লকপ্রিন্ট, ভেজেটেব্‌ল টাই ডাই, সবই হচ্ছে। মেয়েরাই প্রধান কর্মশক্তি। ওখানে পানিরও দরকার। আর বাংলাদেশেতো পানির অভাব নাই। তারপরও সেই কেন্দ্রে উৎপাদনে ব্যবহৃত পানি রিসাইক্লিং করে ব্যবহার করা হচ্ছে। কারন জানার আগ্রহ হল। দেখেশুনে ও কারন জেনে মনে হল শুধুমাত্র মুনাফাকামী শিল্প বোধহয় এইধরনের সার্বিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কাজ করেনা। একটি উন্নয়নকামী সংস্থা আশপাশের পরিবেশের ক্ষতিও বিবেচনা করে বলেই ব্র্যাকের আওতাধীন মানিকগঞ্জের আয়শা-আবেদ ফাউন্ডেশন ওয়াটার রিসাইক্লিং প্লান্ট স্থাপন করেছে। ঢাকা থেকে সামান্য দূরে মানিকগঞ্জ ওখানেই ব্র্যাকের উদ্যোগে শ্রমজীবী নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে আয়েশা-আবেদ ফাউন্ডেশন। সূচীকর্ম, ব্লকপ্রিন্ট, বাটিকপ্রিন্ট, ভেজেটেব্‌ল টাই ডাই সবই মেয়েরা করছেন। সারাবছরই দেশীবিদেশী ভিজিটরদের আগমনে মুখরিত থাকে আয়েশা-আবেদ ফাউন্ডেশন ও সংলগ্ন ব্র্যাক রিজিওনাল অফিস।

ঐ উৎপাদনকেন্দ্রে রয়েছে ওয়াটার রিসাইক্লিং প্লান্ট। প্রথমে একটু খট্‌কা লাগলো এই ভেবে, যে দেশে পানি উপ্‌চে পড়ে সে দেশে কেন আবার ওয়াটার রিসাইক্লিং করা। প্লান্টের ছবি তোলা হল। মানিকগঞ্জ আয়েশাআবেদ ফাউন্ডেশনের ম্যানেজারকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করে একটি যুক্তিপূর্ণ ধারনা পাওয়া গেল। পরিবেশ রক্ষার স্বার্থেই উল্লিখিত ওয়াটার রিসাইক্লিং প্লান্টটি তৈরী হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সীমানা যেখানে শেষ তারপরই খাড়া মাটির পাড়। পরেই নীচুতে আবাদী জমি। শস্য উৎপাদিত হয় ঐ ভূমিতে। ফাউন্ডেশনের ব্যবহৃত পানি খাড়া মাটি বেয়ে নীচে নামতো। ধানক্ষেত পর্যন্ত তখনও পানি পৌঁছয়নি। কিন্তু পানি গড়িয়ে পড়া মাটির শরীর কেমন যেন রং বদলানো শুরু করে। তখনি তারা সাবধান হন। ব্যবহৃত পানি ধানের ক্ষেতে পৌঁছালে শস্য উৎপাদনের ক্ষতি হতে পারে চিন্তা করেই ওয়াটার রিসাইক্লিং প্লান্ট স্থাপন করেন। উন্নয়ন সংস্থা বলেই হয়তো কৃষকের ধানের জমি যাতে রাসায়নিক মিশ্রিত পানিতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে দিকে তাদের লক্ষ্য ছিল। যদিও ঐ এলাকার কৃষকদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়নি। তাই জানা হলোনা যে কৃষকেরাও জমি বাঁচানোর জন্য ফাউন্ডেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কিনা। যদি ধরে নিই যে এলাকার কৃষকের সচেতনতার কারনেই আয়শাআবেদ ফাউন্ডেশন পানি শোধন প্রকল্প তৈরী করেছে। তবুও সংস্থাটি গরীবের উন্নয়নে নিবেদিত না হলে এতো সহজে এর দ্বারা কৃষকের স্বার্থ ও পরিবেশ রক্ষায় বোধহয় উদ্যোগী হতোনা।

কথা হল অন্যান্য শিল্প উৎপাদনকেন্দ্র যারা তাদের ব্যবহৃত পানি বাইরে বইয়ে দেন তারাও এভাবে রিসাইকেল করে পানিটুকু আবার ব্যবহার করতে পারেন। এতে রাসায়নিক মিশ্রিত পানি থেকে নদী বা পরিবেশ রক্ষা পাবে। তবে শুধুমাত্র মুনাফার লক্ষ্যে(মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়) পরিচালিত শিল্প পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে ওয়াটার রিসাইক্লিং প্লান্ট তৈরীতে অর্থ খরচে হয়তো আগ্রহী হবে কিনা সন্দেহ আছে।

এবিষয়ে সরকার পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে কিছু নীতি প্রণয়ন করতে পারেন। যেমন যে যে যে শিল্পপ্রতিষ্ঠাণ পানি শোধন করে ব্যবহার করবে তাদের আয়কর রেয়াত(Tax exemption) দেয়া। এছাড়াও সচেতন সংগঠন বাপা(বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন), বেন (Bangladesh Environment Network) জনগনের সহযোগীতায় এই লক্ষ্যে এগিয়ে এসে চাপ সৃষ্টি করতে পারেন।

আনন্দের সংবাদ পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করতে সহজ ও সুলভ পদ্ধতি আবিষ্কার করে সম্মানিত ও পুরষ্কৃত হয়েছেন বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিকেরা। শুধু বাংলাশে নয় পৃথিবীর অনেক দেশেই পানিতে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। এই আবিষ্কার সবারই উপকারে লাগবে।

নদীবিধৌত মাটিতে কতকিছু উৎপাদিত হয়। যার ফলে বিলাতী ব্যবসায়ীরা(যুক্তররাজ্যের বিজনেস্‌ম্যানরা) খুব আগ্রহের সাথে বাংলাদেশে সাধারন কৃষকের(শিল্পদ্যোক্তা কৃষিমালিকের ফার্মে নয়) ফলানো সব্জী(এমনকি স্নো পিজও)

আমদানী করে নিয়ে যাচ্ছে। তেমনি একদিন নদী বহমান বাংলাদেশ থেকে চাল ও নারকেল কিনতে অষ্ট্রেলিয়ার বানিজ্যিক প্রতিনিধি গিয়ে হাজির হবে হয়তো।

নিজেদের প্রয়োজনেতো অবশ্যই পাশাপাশি তেমন সোনালী দিনের জন্যেই নদী ও পানিকে বাঁচাতে হবে।